Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501034 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Baru Chandidas's 'Sri Krishna Kirtan': A Discussion on Commentary

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' : বৃত্তি প্রসঙ্গ

Riya Chowdhury
Researcher
Bengali Department
Visva-Bharati

Received on: 07th May 2026
Accepted on: 18th May 2026

Abstract:
In the history of medieval Bengali literature, Baru Chandidas's 'Sri Krishna Kirtan' stands as a significant poetic work. The poem centers on the divine love-play ('Prem-lila') between Radha and Krishna. However, the work does not merely recount the romantic interactions of Radha and Krishna; it also vividly portrays various social realities of that era. Prominent among these is the theme of occupations within society. The poet's work depicts a diverse array of professions — including cowherding, shepherding, oil-pressing, ferry-piloting, and barbering. Through these portrayals, readers can gain valuable insights into the occupational landscape and economic conditions of that historical period.

Key Words:
Social, Economic, Vocational, and Real-life Perspectives.

মূল প্রবন্ধ

আদি-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাব্য হলো 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্য । কাব্যটি বড়ু চণ্ডীদাসের লেখা। কাব্যটি যেহেতু আদি-মধ্যযুগের সাহিত্য নিদর্শন, সেহেতু কাব্যটি থেকে আমরা আদি-মধ্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতির বাস্তব চিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করি। কারণ বাংলায় তো একটি বহুল প্রচলিত কথা আছেই — "সাহিত্য হলো সমাজের দর্পণ।" অর্থাৎ সমাজকে 'রিপ্রেজেন্ট' করা হলো সাহিত্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বড়ুর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যও এর ব্যতিক্রম নয়। কাব্যটি পাঠ করে পাঠক তৎকালীন বাস্তবচিত্র সম্পর্কে অনেকটাই সমৃদ্ধ হতে পারেন। অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য তাঁর 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র' গ্রন্থে জানিয়েছেন — "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নিছক পুরাণ অনুসৃত কাব্যগ্রন্থ নহে, এখানে কবি স্বাধীনভাবে বহু কাহিনী সংযোজিত করিয়াছেন বহু নূতন ঘটনা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যাহার মধ্য দিয়া কবির আপন দেশ ও কালের কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করা যায়।"[১] যে-কোনো দেশ ও কালের বিকাশ বা অগ্রগতি নির্ভর করে সেই দেশ ও কালের অর্থনীতির ওপর। আর দেশ ও কালের অর্থনীতি নির্ভর করে সেই দেশ ও কালের মানুষের বৃত্তির ওপর।

এখন প্রশ্ন, বৃত্তি কী? বৃত্তি বলতে সাধারণ অর্থে জীবিকা বা পেশাকে বোঝায়। তবে বিশেষ অর্থে এই বৃত্তি-ই একটি দেশ বা সমাজের অগ্রগতির মূল ভীত। আবার অনেক সমাজে এই বৃত্তির ওপর নির্ভর করেই মানুষকে সম্মান দেওয়া হয়। এই চিত্র শুধু আজ যে দেখা যায় — তা কিন্তু একেবারেই নয়। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যেও এই চিত্র বারবার উঠে এসেছে কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তিতে। যাই হোক, এখন এই আলোচনায় আদি-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সহিত্যিক নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যে তৎকালীন সময়ের বৃত্তি প্রসঙ্গ বা অর্থনৈতিক চিত্র কাব্যের পঙক্তিতে কীভাবে উঠে এসেছে — তা দেখার চেষ্টা করবো।

© Santiniketan Sahityapath

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যে কবির কলমে সমাজের বিভিন্ন বৃত্তির প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। তবে সেই বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে সর্বাগ্রে যে বৃত্তির কথা বলা প্রয়োজন, তা হলো — গোয়ালা বা গোপ বৃত্তি। এদের কাজ গাভি দুগ্ধ থেকে বিভিন্ন উপকরণ যেমন — ঘি, দুধ, দই, মাখন ইত্যাদি তৈরি করে বাজারে বিক্রি করা এবং অর্থ উপার্জন করা। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যে আমরা প্রথম থেকেই এই পেশার উল্লেখ পাই। কাব্যে 'জন্মখণ্ড'এর শেষের দিকে দেখা যায়, আইহানের মা রাধাকে হাটে-বাটে-সর্বত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বড়াইকে নিযুক্ত করেন। এরপরই তাম্বুলখণ্ডে বড়াই রাধাকে নিয়ে মথুরার হাটে দধি-দুগ্ধ বিক্রির উদ্দেশ্যে পসরা সাজিয়ে যাত্রা করেন। কবির কথায় —

"দধি দুধেঁ পসার সজাআঁ।
নেত বাস ও[৬/১]হাড়ন দিআঁ।। ল রাধা।।
সব সখিজন মেলি রঙ্গো।
একচিত্তে বড়ায়ির সঙ্গো।। ল রাধা।।১।।"[২] (তাম্বুলখণ্ড)

এই চিত্রের মধ্যে দিয়ে কাব্যে গোয়ালা বৃত্তির প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। পাশাপাশি এখানে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মথুরাতে দধি-দুগ্ধ বিক্রি করতে যাচ্ছে কোনো পুরুষ নয়, সমাজের নারীরা। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে সে যুগে গোপবধূরা বাড়ির বাইরে বেরোতে পারতেন এবং হাটে ব্যবসার কাজে যেতে পারতেন। এ ব্যাপারে তাঁদের সমাজে কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। সমালোচকের ভাষায় — "তৎকালে সকল স্ত্রীলোকই যে ঘরের বাহির হইত তাহা নয় তবে গোপজাতের কন্যারা আপন ব্যবসা ও জীবিকার কাজে দধিদুধের পসরা লইয়া হাটে বেচিতে যাইত।"[৩] রাধা এবং অন্যান্য সখীরা দধি দুগ্ধ বিক্রি করতে মথুরা হাটে যাচ্ছে। এতে তাদের কোনো চাপ নেই, ক্লান্তি নেই, নেই সমাজের কোনো নিষেধ; পরিবর্তে এই যাত্রার মধ্যে রয়েছে আনন্দ। সেই চিত্রও কাব্যে কবির কলমে উদ্ভাসিত হয়েছে। উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। যেমন, তাম্বুলখণ্ডের শেষে আছে —

"ঘৃত দধি দুধ ঘোলেঁ সাজি[১৫/২]আঁ পসার।
নেত বসন দিআঁ উপরে তাহার।।
আনুমতী লআঁ রাধা সাসুড়ীর থানে।
লাস বেশ করে রাধা বড়ই বিহাণে।।১।।
মথুরা চলিলী রাধা বড়ায়ির সঙ্গো।
সব সখিজন লআঁ আতি বড় রঙ্গো।।ল।।ধু।।"[৪] (তাম্বুলখণ্ড)

অর্থাৎ রাধা দধি-দুগ্ধ-ঘৃত-ঘোল নিয়ে শাশুড়ির অনুমতিক্রমে সখী এবং বড়ায়ের সঙ্গে 'রঙ্গো' অর্থাৎ আনন্দের সঙ্গে হাটে যাত্রা করছে। রাধাকে হাটে যেতে হলে প্রত্যহ যমুনা নদী পার করতে হয়। কৃষ্ণ সেই খবর জানে। সেই সুযোগে একদিন কৃষ্ণ যমুনা ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে রাধা-সহ বাকি সখীদের পথে বাধা দেন এবং কংসের নাম করে দান চেয়ে বসেন। কৃষ্ণ বলেন —

"বাটদান হাটদান লইলোঁ রাজঘরে।
তেকারণে আইলোঁ মোএঁ যমুনার তীরে।।
নিতি নিতি[২১/২]যাহা তোহ্মে মথুরা নগরে।
সব সুবিধান দান দেহ ত আহ্মারে।।১।।"[৫] (দানখণ্ড)

এরপর কৃষ্ণ রাধার কাছে দধি ঘৃত প্রভৃতি পসরার জন্য একে একে দান চান। প্রত্যুত্তরে রাধা বলেন —

"নিতি নিতি দধি বিকে জাওঁ।
দাণের সুধী নাহি পাওঁ।।
এবেঁ রাজা ধনের কাতর।
চাহে যবেঁ দুধে দিবোঁ কর।।৩।।"[৬] (দানখণ্ড)

অর্থাৎ রাধার কথায় কংস যদি দুধ বিক্রির ওপর কর চাপায়, তাহলে তা দিতে হবে। শাসক যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেয়, সাধারণ প্রজা তা মানতে বাধ্য। একথা এযুগে যেমন সত্য তেমনি সব যুগের ক্ষেত্রেই সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। এর অন্যথা রাধা বা যে-কোনো

সাধারণ প্রজার ক্ষেত্রে করা সম্ভব নয়। পাশাপাশি কৃষ্ণ হাটের শুল্ক এবং পথের শুল্কের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে যে কর চেয়েছেন (যদিও এটি ছলনা) এই চিত্র আজকের যুগেও লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ এই যে কর চাওয়ার চিত্র এ প্রত্যেকটি সমাজেরই বাস্তব চিত্র। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আজও আমাদের দেশে নানা কর প্রথা (Tax System) প্রচলিত রয়েছে। এর উপর দেশের অর্থনীতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যে আমরা দেখি কৃষ্ণ মূলত রাখল বালক। রাখালরা মূলত গোরু-বাছুর চরায়। এটিও একটি পেশা। এই পেশা বহু প্রাচীন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যেও এই পেশার উল্লেখ রয়েছে। কাব্যে দেখা যায় কৃষ্ণ প্রত্যহ বৃন্দাবনে গাভি নিয়ে যান এবং তাদের দেখাশোনা করেন। এই চিত্র আমরা বৈষ্ণব পদাবলির বাৎসল্য রসপর্যায়ের বিভিন্ন পদকারের পদেও লক্ষ করি। যেমন, যাদবেন্দ্র একটি পদে বলেছেন —

"আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি।।"[৭]

এখানে দেখা যায়, কৃষ্ণ ধেনু নিয়ে গোষ্ঠে বেরিয়েছেন। এরকম আর একটি চিত্র তুলে ধরছেন বৈষ্ণব পদকর্তা গোবিন্দদাস তাঁর একটি পদে। সেখানে দেখা যায় মাতা যশোদা গোপালকে গোষ্ঠে পাঠানোর পূর্বে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। তিনি বলছেন —

"নিকটে গোধন রেখো মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈলা গোপ-জাতি গোধন-পালন-বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাইয়া দিব।।"[৮]

অর্থাৎ এখানেও আমরা কৃষ্ণের 'গোধন-পালন-বৃত্তি' প্রসঙ্গ পাচ্ছি। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যেও এই প্রসঙ্গ বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। 'জন্মখণ্ডে' কবি কৃষ্ণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন — "নিতি নিতি বাছা রাখে গিআঁ বৃন্দাবনে।"[৯] আবার কাব্যে 'তাম্বুলখণ্ডে'র শুরুতেই দেখা যায় বড়াই রাধাকে নিয়ে মথুরার হাটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং বনমধ্যে রাধাকে হারিয়ে ফেলেন। তখন বড়াই বিভিন্ন স্থান সন্ধান করেও রাধার কোনো খোঁজ পান নি। শেষে তিনি দেখতে পান বৃন্দাবনে অনেক গোরু চরছে এবং সেখানে রয়েছে একজন রাখাল। এই রাখাল আর কেউ নন, তিনি হলেন কৃষ্ণ। কবির বর্ণনায় —

"কথো দূর পথ গিআঁ দেখিল বড়ায়ি।
বৃন্দাবন মাঝে চরে শতসংখ্য গাই।।
তাক দেখি বড়ায়ির মনেত হরিষে।
এহা রাখোআল পুছোঁ রাধার উদ্দেশে।।৩।।"[১০] (তাম্বুলখণ্ড)

এর থেকে তৎকালীন সময়ের রাখাল বৃত্তির প্রসঙ্গ কাব্যে উঠে আসে। আমাদের সমাজে দেখা যায় মানুষের পেশা দেখে মানুষকে অনেক সময় সম্মান দেওয়া হয় অথবা পেশার কারণেই অসম্মানও করা হয়। এই চিত্রের আভাস কাব্যেও কিছুটা পাওয়া যায়। দানখণ্ডে কৃষ্ণ দানী সেজে দান প্রার্থনা করে রাধার পথ আটকায়। এ দান "শুধু যে পণ্যদ্রব্যের জন্য দান তাহা নয় রাধার সাড়ে তিন হাত দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের জন্যও কৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ দান ধার্য করিয়া দুই কোটি দান দাবি করে।"[১১] তখন রাধা বলেন —

"রাখোআল কাহ্নাঞি তোতে হেন বোল সাজে।
বড়ার বহুআরী আয়ে পাইএ বড় লাজে।।"[১২] (দানখণ্ড)

অর্থাৎ রাখাল কৃষ্ণের মুখে একথা মানায় না। এই খণ্ডে এমন আরো অনেক উদাহরণ আছে। যেমন, কৃষ্ণ যখন নিজেকে "স্বগ্ গ মর্ত্য পাতালে আহ্মার এক কায়া"[১৩] — বলে দাবি করেন তখন রাধা আবার কৃষ্ণকে সামান্য রাখাল বলে উপহাস করেন —

"রাখোআল হআঁ বোল জগতনিবাস।
সুণিআঁ করিব তোরেঁ লোক উপহাস।।৯।।"[১৪] (দানখণ্ড)

© Santiniketan Sahityapath

রাধা এইসব কথা মূলত কৃষ্ণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষার প্রসঙ্গে বললেও, এর মধ্যে দিয়ে সমাজে বৃত্তি-বৈষম্য চিত্রের কিছুটা আভাস কাব্যে প্রকট হয়ে উঠেছে।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যে আমরা আরো কয়েকটি বৃত্তির কথা পাই, তার মধ্যে অন্যতম হলো পাটনি বৃত্তি। পাটনি বলতে নৌকার মাঝিদের বোঝায় অর্থাৎ নৌকা চালকদের বোঝানো হয়। বহু বছর পূর্বে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের প্রধান অবলম্বন ছিল নৌকা। বড়ুর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' দেখা যায় রাধাকে মথুরার হাটে যাওয়ার জন্য যমুনা নদী পার হতে হয়। এক্ষেত্রে রাধার একমাত্র ভরসা হলো নৌকা। নৌকাখণ্ডে আমরা দেখি রাধা সহ গোপিরা দধি-দুগ্ধের পসরা নিয়ে যমুনার তীরে এসে যমুনা পার হওয়ার জন্য নৌকার খোঁজ করতে থাকেন। রাধা বলেন —

"ঘাটের ঘাটিআল কহি গেল সে।
দধির চুপড়ী মোর পার করি দে।।ধ্রু।।"[১৫] (নৌকাখণ্ড)

এরপর কিছুটা দূরে রাধা একটি নৌকা দেখতে পান। তা দেখে রাধা সত্বর সেদিকে যান। কবির বর্ণনায় —

"কথো দূর গিআঁ দেখিএ একখানী নাএ।
সত্বর হয়িআঁ রাহী তার পাস যাএ।।২।।"[১৬] (নৌকাখণ্ড)

এই চিত্রের মধ্যে দিয়ে কাব্যে পাটনি বৃত্তির প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

কাব্যে পাটনি বা মাঝি বৃত্তি ছাড়াও নাপিত বৃত্তির প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। এই বৃত্তি আজও সমাজে বর্তমান। কাব্যে নাপিত বৃত্তির কথা উঠে এসেছে রাধার উক্তিতে। দানখণ্ডে কৃষ্ণ যখন রাধার আলিঙ্গান প্রার্থনা করে রাধার শারীরিক বর্ণনা দিতে থাকে তখন রাধা অত্যন্ত ব্যাথিত চিত্তে বড়াইকে বলেন নাপিত ডেকে আনতে। তিনি অপমানে তাঁর নিজের খোঁপা মুণ্ডিত করবেন। রাধার উক্তি —

"আন[৪৫/২]দাক দিআঁ বড়ায়ি নাপিতের পো।
কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িবোঁ মো।।"[১৭](দানখণ্ড)

অর্থাৎ রাধা আর অপমান সহ্য করতে পারছেন না। এই প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পেশা 'নাপিত' বৃত্তির কথা কাব্যে চিত্রিত হয়েছে।

নাপিত বৃত্তি ছাড়াও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যে তেলি বৃত্তির কথা রয়েছে। দানখণ্ডে দেখা যায় কৃষ্ণ যখন রাধার কাছে দান চান এবং নানাভাবে তাঁর আলিঙ্গান প্রার্থনা করেন, তখন রাধা আক্ষেপ করে বলেন —

"ঘরের বাহির হৈতেঁ তেলিনি তেল বিচিতেঁ
কাক কাক বএ সুখান গাছের ডালে।"[১৮] (দানখণ্ড)

রাধা এখানে মূলত অমঙ্গালসূচক চিহ্নের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে চেয়েছেন, কিন্তু এর মধ্যে দিয়েও সেই সময়কার তেলি পেশার অর্থাৎ যারা তেল উৎপাদন করেন, তাদের কথা কাব্যে উঠে এসেছে কবির কলমে। কাব্যে আরো কয়েকটি স্থানে এই তেলি বৃত্তির উল্লেখ নজরে পড়ে। সে যাই হোক, এখন তেলি বৃত্তির প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে কুমোর বৃত্তির প্রসঙ্গে আসা যাক। কুমোরদের কাজ মূলত মাটির বিভিন্ন পাত্র নির্মাণ করা এবং সেই পাত্রকে আগুনে পুড়িয়ে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা। কাব্যের বংশীখণ্ডে আমরা এই কুমোর বৃত্তির উল্লেখ দেখতে পাই। রাধা কৃষ্ণের বাঁশি শুনে আকুল। তিনি নিজের কাতর অবস্থার চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে কুমোরের প্রসঙ্গ এনেছেন —

"বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী।।"[১৯] (বংশীখণ্ড)

রাধার এই উক্তিতে তৎকালীন সমাজের কুমোর বৃত্তির প্রসঙ্গ কাব্যে এসেছে। তৎকালীন সমাজে যে ভিক্ষাবৃত্তিরও চল ছিল তা দানখণ্ডে কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তিতে ধরা পড়ে কৃষ্ণ যখন রাধার পথ আটকে তাঁর কাছে দান চেয়ে বসেন তখন একসময় দেখা যায় রাধা কৃষ্ণকে বলেন —

© Santiniketan Sahityapath

"সুণ তোঁ নিলজ কাহ্ন কিসক সাধহ দান
কোন বিধ বথুর উপরে।
জীবারে নারহ যবেঁ হেনক করহ তবেঁ
ভিক্ষা মাঙ্গাহ ঘরে ঘরে।।২।।"[২০] (দানখণ্ড)

এই উক্তির মধ্যে দিয়ে ভিক্ষা বৃত্তির প্রসঙ্গ কাব্যে উঠে এসেছে। এই ভিক্ষাবৃত্তি এযুগে এসেও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি; এযুগেও এই বৃত্তি সমানভাবেই সচল।

এই আলোচনার উপসংহারে এসে বলা যায়, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' আদি-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। কাব্যটি রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলা বিষয়ক কাব্য হলেও কাব্য জুড়ে রয়েছে কবির সময়ের সামাজিক বিভিন্ন বাস্তব চিত্র। তার মধ্যে অন্যতম সমাজের বৃত্তি প্রসঙ্গ। গোপ-বধূদের বানিজ্য, রাখাল প্রসঙ্গ, পাটনি থেকে, নাপিত থেকে শুরু করে তেলি, কুমোর কোনো বৃত্তি তুলে ধরার ক্ষেত্রে কবি কার্পণ্য করেন নি। এককথায় বলা যায়, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যে মধ্যযুগীয় বৃত্তি প্রসঙ্গ উজ্জ্বলরেখায় অঙ্কিত হয়ে রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র', অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, অষ্টাদশ সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯, জুন ২০২২, পৃ. ১১৬, ভূমিকা অংশ (অতঃপর গ্রন্থটি 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র' নামে উল্লিখিত)
২। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন', চণ্ডীদাস-বিরচিত, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ষষ্ঠ সংস্করণ ১৩৬৪, পৃ. ৪ (অতঃপর গ্রন্থটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামে উল্লিখিত)
৩। 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র', পৃ. ১১৬
৪। ' শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন', পৃ. ১৩
৫। ওই, পৃ. ১৬-১৭
৬। ওই, পৃ. ১৯
৭। ' বৈষ্ণব পদাবলী', ড. সত্য গিরি, রত্নাবলী, ৫৫ ডি কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ/ তৃতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪২৪/ জুলাই ২০১৭, পৃ. ১৭৪
৮। ওই, পৃ. ১৭২
৯। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন', পৃ. ৩
১০। ওই, পৃ. ৪
১১। 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র', পৃ. ৮৬,
১২। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন', পৃ. ২২
১৩। ওই, পৃ. ৩১
১৪। ওই, পৃ. ৩১
১৫। ওই, পৃ. ৫৭
১৬। ওই, পৃ. ৫৭
১৭। ওই, পৃ. ৩৫
১৮। ওই, পৃ. ৪৬
১৯। ওই, পৃ. ১১৬
২০। ওই, পৃ. ৪২

© Santiniketan Sahityapath